Journal of Rajshahi College
Rajshahi 6000, Bangladesh
www.rc.gov.bd
J R C

Open Access
ISSN 2959-8702

Original Article

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত বারোবাজারের সমাধিক্ষেত্র

(The Barobazar Burial Site Discovered Through Archaeological Excavation)

মো. আব্দুল মতিন
(Md. Abdul Motin)

প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী-৬০০০, বাংলাদেশ
(Professor, Islamic History & Culture, Rajshahi College, Rajshahi 6000, Bangladesh)

Corresponding author's e-mail: mdabdulmatin16b@gmail.com

Received: 25 July 2024
Revised: 01 November 2024
Accepted: 19 December 2024
Published: 24 December 204

Volume 02
Issue 01
Page 1-11

Cite মো. আব্দুল মতিন (২০২৪) প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত বারোবাজারের সমাধিক্ষেত্র। *J. Raj. Col.* **2**(1):1-11.

© 2024 The Authors.
Journal of Rajshahi College published by Rajshahi College, Rajshahi 6000, Bangladesh.
www.rc.gov.bd

ABSTRACT ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন বারোবাজার বর্তমানে এক বিলুপ্ত নগরী ও দক্ষিণ বঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। বাংলার প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শহরগুলোর তালিকায় বারোবাজারের নাম নেই। কয়েক'শ বছর ধরে লুপ্ত এই শহরটি অত্যন্ত অবহেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় দৃষ্টির অগোচরে ছিল গবেষকদের। বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী অসংখ্য ঢিবি, দিঘি-পুকুর-জলাশয়, প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো ইট-পাথর, সমাধি বা কবর স্বভাবতই মানব মনে কৌতুহলের জন্ম দেয়। ১৯৬১ সালে বারোবাজারকে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায় আনা হয় এবং ১৯৬৯ সালে সর্বপ্রথম স্থানীয় লোকজন ঝোঁপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে ও খননকার্য চালিয়ে গোড়ার মসজিদটি আবিষ্কার করে নামাজ পড়া শুরু করে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আশি ও নব্বইয়ের দশকে বেশকিছু ঢিবিতে খননকার্য চালিয়ে ১৫টি স্থাপনা যার সবগুলোই মসজিদ এবং বেশকিছু সমাধিস্থল ও পাকা কবর আবিষ্কার করে। রাজকীয় গ্যালারি সম্বলিত মসজিদ, জাহাজঘাটা, দিঘি-পুকুর, সমাধি এগুলো দেখে সহজেই অনুমেয় যে সুলতানি বাংলার এক গৌরবময় শহর ছিল বারোবাজার যা সমকালীন সময়ে টাকশাল নগরী মাহমুদাবাদ বা মুঘল যুগের সরকার মাহমুদাবাদ বলেই সাম্প্রতিক গবেষকদের ধারণা। গলাকাটা মসজিদ ও দিঘির সামনে একটা সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে 'শহর মোহাম্মদাবাদ'। উৎখননে প্রাপ্ত ১৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক অবকাঠামোর মানচিত্রও রয়েছে এই সাইন বোর্ডে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপনা নিয়ে বেশকিছু গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও সমাধিক্ষেত্র নিয়ে কোন গবেষণাকর্ম বা প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। অথচ হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস পুনরুদ্ধারে সমাধি বা কবর হতে পারে গবেষণার অন্যতম অনুসঙ্গ। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

Keywords: বারোবাজার, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন, সমাধিক্ষেত্র, প্রত্নসম্পদ

This article is licensed under a *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License*, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if you modified the licensed material. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

১. ভূমিকা

এককালের খরস্রোতা ভৈরব নদ তীরবর্তী বারোবাজার দক্ষিণবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল। বারোবাজার শহর কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারা শাসন করেছিল, কেনই বা শহরটি পরিত্যক্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। বারোবাজারের প্রাচীনত্ব নিয়ে গবেষকদের কাছে কোন লিপিসাক্ষ্য বা ঐতিহাসিক দালিলিক প্রমাণ না থাকায় এ বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে গবেষকগণ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন যে, মুসলিম অধিকারের পূর্বেই বারোবাজারে একটি জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র এবং তুর্কি-আফগান যুগে বা তারও পূর্বে একটি জনাকীর্ণ শহর ও বন্দর গড়ে উঠেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে বিপুল সংখ্যক বিদ্যমান ও অবিদ্যমান মসজিদ ও স্থাপনা, শিলালিপি, টেরাকোটা লিপি, সমাধিস্থল বা কবর, জাহাজ ঘাটা, অসংখ্য দিঘি-জলাশয় ও মুদ্রা আবিষ্কার এবং দীর্ঘ গবেষণায় বারোবাজারের ইতিহাসের জট খুলতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞগণ একপ্রকার নিশ্চিত হয়েছেন যে, বারোবাজার মুসলিম শাসন ও সভ্যতার এক আলোকোজ্জ্বল ঐতিহাসিক নগরী এবং তা সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-৫৯ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত টাকশাল নগরী মাহমুদাবাদ যা মুঘল যুগের সরকার মাহমুদাবাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র। কারণ ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বারোবাজার নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার জোড়বাংলা মসজিদে প্রাপ্ত ভগ্ন টেরাকোটা ফলকেও (ইট লিপি) মুহাম্মাদাবাদ [১] শব্দটির ব্যবহার থাকায় টাকশাল নগরী মাহমুদাবাদের যুক্তিটি আরও জোরালো হয়েছে। তাছাড়া বারোবাজারে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ সমাধিস্থল ও পাকা দীর্ঘ কবর থেকেও সহজেই মুসলিম শাসন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রের স্বীকৃতি মেলে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত বারোবাজারের সমাধিস্থল বা কবর ও ইতিহাস বিনির্মাণে এর ভূমিকা বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২. বারোবাজার পরিচিতি

বারোবাজার বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন একটি ক্ষুদ্র ইউনিয়ন প্রশাসনিক কেন্দ্র বা একটি গ্রাম হিসেবে পরিচিত। স্থানটি ঝিনাইদহ শহর হতে ১৭ মাইল দক্ষিণে [২], যশোর শহর হতে ১০ মাইল উত্তরে [৩] এবং কালীগঞ্জ উপজেলা শহর থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে এক সময়ের প্রমত্তা ভৈরব নদের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। বারোবাজার ইউনিয়নটি কালীগঞ্জ উপজেলার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। এর উত্তরে রায়গ্রাম এবং মালিয়াট ও রাখালগাছি ইউনিয়নের কিছু অংশ অবস্থিত। সমগ্র দক্ষিণ সীমানায় এবং পূর্বের বৃহৎ সীমানায় যশোর সদর উপজেলা স্পর্শ করেছে। পশ্চিমে কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়ন অবস্থিত। এই ইউনিয়নের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানায় ঐতিহ্যবাহী ভৈরব নদ এবং উত্তর পূর্বের সীমানার মঙ্গলপৈতা এবং বারফা গ্রামের গাঁ ঘেঁষে চিত্রা নদী প্রবাহিত। বারোবাজার ইউনিয়নটি বাদেডিহি, বাদুরগাছা, বারোবাজার, বারফা, বেলাট-দৌলতপুর, ফুলবাড়ি, গ্রাম মাজদিয়া, হাসিলবাগ, জগন্নাথপুর, জলকার মাজদিয়া, লুছিয়া, মহিষাহাটি, মঙ্গলপৈতা, মিঠাপুকুরিয়া, পিরোজপুর, সাদিকপুর, সোনালীডাঙ্গা, সুবর্ণসরা, ঠিকডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম বা মৌজা নিয়ে গঠিত। যশোর-ঈশ্বরদী রেল লাইন এবং ঢাকা খুলনা মহাসড়কটি বারোবাজারের বুক চিরে ধাবমান। রেল লাইনটি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত যা আজও সক্রিয় রয়েছে। বারোবাজার যে দক্ষিণবঙ্গের একটি প্রাচীন জনপদ এ বিষয়ে এখন আর কারো সংশয় নেই। এ প্রসঙ্গে আ. কা. ম. যাকারিয়া 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যশোর শহর থেকে প্রায় ১০ মাইল উত্তরে যশোর-ঝিনাইদহ পাকা সড়কের উপরে ও প্রাচীন (বর্তমানে মৃতপ্রায়) ভৈরব নদের বাম (উত্তর) তীরে অবস্থিত বারোবাজার একটি অতি প্রাচীন স্থান [৪]। সতীশচন্দ্র মিত্র বারোবাজারকে সমতটের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন [৫]। স্থানীয় লেখক হোসেন উদ্দীন হোসেনের মতে, খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গঙ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল বারোবাজার। তখন বারোবাজারের নাম ছিল গঙ্গ বা গঙ্গরোডিয়া [৬]। কানিংহাম চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং-এর বিবরণের উপর ভিত্তি করে সমতটের রাজধানী মুড়লী বা বর্তমান যশোর অথবা এর সন্নিকটে অনুরূপ কোন স্থান নির্দেশ করেছেন [৭]। সতীশচন্দ্র মিত্র বারোবাজারের ভৌগলিক অবস্থান, প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনাবলির ভগ্নস্তূপ প্রভৃতির সাথে কানিংহামের বিবরণের ধারণায় মুড়লী বা যশোরের কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত বারোবাজারকে সমতটের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন [৮]। তবে বারোবাজারের ভৌগলিক অবস্থান, উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ও হিন্দু নাম সম্বলিত অসংখ্য দিঘির অবস্থান [৯], বারোবাজারের নিকটবর্তী মুসলিম পূর্ব যুগের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল যেমন-ভরত-ভায়না, গৌরিঘোনা, সেনহাটি, আগ্রাকপিলমুনি, আমাদী, চন্দ্রকেতুগড়, বেড়াচাম্পা প্রভৃতির অবস্থান [১০] ইত্যাদি বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে সমতটের রাজধানী যে বারোবাজার ছিল সতীশচন্দ্র মিত্রের এই অভিমত প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়।

ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বারোবাজার অঞ্চল বঙ্গরাজ্যের অধীনে আসে। পরবর্তীতে এটি শশাংক (৬০৬-৬৩৭ খ্রি.) এবং হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭ খ্রি.) শাসনাধীনে আসে। তখন দুটি বৌদ্ধ রাজবংশ যথা-খড়গ এবং

পালরা এ এলাকা শাসন করতো। পরবর্তীকালে বর্মণ এবং সেনরা এ অঞ্চলে শাসন কায়েম করে। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের সময় যশোর অঞ্চল সেন শাসনাধীনে আসে [১১]। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বঙ্গ জয় করলেও সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৪২-৫৯ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বারোবাজার অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রি.) [১২], শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রি.) [১৩] এবং জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৪-১৪৩২ খ্রি.) সময় সাময়িকভাবে এ অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে এসেছিল বলা যায়।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে বারোবাজার সম্ভবত সোনারগাঁও এর অধীনে ছিল [১৪] এবং জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহের সময় অঞ্চলটি ফতেহাবাদ প্রশাসনিক কেন্দ্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী ও সেনাপতি টডরমল ভূমি জরিপের সময় বাংলা সুবাকে ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২টি পরগণায় ভাগ করেন [১৫]। এ সময় মাহমুদাবাদ সুবে বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য সরকার ছিল। সুলতানি বাংলার শহর মাহমুদাবাদের নামানুসারে মুঘল আমলেও সরকার মাহমুদাবাদের নামকরণ হয়েছিল [১৬]। নলদী, সাতৈর, মাহমুদশাহী ও নুসরতশাহী ছিল এর প্রধান মহল। 'আইন-ই-আকবরী'র বিবরণ অনুযায়ী সরকার মাহমুদাবাদের মহল ছিল ৮৮টি এবং রাজস্ব ছিল ১১,৬০২,২৫৬ দাম। সরকার মাহমুদাবাদ উত্তর-পূর্ব নদিয়া, উত্তর-পূর্ব যশোর ও ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল [১৭]।সরকার খলিফাতাবাদ মাহমুদাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। উল্লেখিত বিবরণ Jhon Beames এবং Irfan Habib প্রদত্ত মানচিত্র অনুযায়ী সরকার মাহমুদাবাদের সীমা নির্দেশ করতে গেলে বলা যায়, মাহমুদাবাদের উত্তর-পশ্চিমে সরকার বারবকাবাদ, উত্তর-পূর্বে সরকার বাজুহা, দক্ষিণে সরকার খলিফাতাবাদ, পূর্বে সরকার ফতেহাবাদ এবং পশ্চিমে সরকার সাতগাঁও অবস্থিত ছিল। সুতরাং আধুনিক যশোরের উত্তরের বৃহৎ অংশ ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্পূর্ণ অঞ্চল এবং পাবনার দক্ষিণের কিছু অংশ যে মাহমুদাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সুলতানি বাংলার অন্যান্য প্রশাসনিক কেন্দ্র যেমন–গৌড়, লখণৌতি, বাঘা, ফতেহাবাদ, খলিফাতাবাদ প্রভৃতি আনুমানিক প্রায় ১০০ কিলোমিটার দুরত্বে অবস্থিত। তেমনি বারোবাজার [১৮] অঞ্চলটি পার্শ্ববর্তী ফতেহাবাদ হতে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৪২-৫৯ খ্রি.) সময় থেকে মাহমুদাবাদের নাম শ্রুত হয় এবং তখন থেকেই মাহমুদাবাদ, ফতেহাবাদ, খেজানা (কোষাগার) এবং দার-আল-জর্ব (টাকশাল) নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায় [১৯] এবং মুদ্রা বিচারে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় (১৪৪২ খ্রি.) থেকে হাবশী শাসন এবং হোসেন শাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের শাসনকাল (১৫৩১ খ্রি.) পর্যন্ত মাহমুদাবাদ একটি প্রসিদ্ধ টাকশাল নগরী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। সুতরাং ভৌগলিক অবস্থান ও মুদ্রা বিচারে বারোবাজার মাহমুদাবাদ তথা সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১ম) কর্তৃক নির্মিত শহর মাহমুদাবাদ হওয়ায় স্বাভাবিক বলেই মনে হয় [২০] তবে সরকার মুহাম্মদাবাদ [২১] শহর মুঘল আমলের মাঝামাঝি সময়ে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ নামটি ঐ সময়ের পর থেকে ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না [২২]।

আ. কা. ম. যাকারিয়া বারোবাজারের নামকরণ সম্পর্কে বলেছেন, মুসলিম শাসনামলে এখানে একটি বড় বাজার হয়তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বড় বাজার থেকেই খুব সম্ভব বারোবাজার নামটি হয়ে থাকবে [২৩]। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, খাঁ জাহান সদলবলে প্রথমে বারোবাজার এসে অবস্থান করেন এবং সম্ভবত তিনি তাঁর বারজন সফর সঙ্গীকে ধর্মপ্রচারার্থে এ প্রদেশে রেখে যান, তারাই বারোবাজারের নতুন নাম রাখেন। পূর্বে এ স্থানের নাম ছিল সম্ভবত ছাপাইনগর বা চাম্পাইনগর [২৪]। স্থানীয় জনশ্রুতি এবং সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বারোজন [২৫]। আউলিয়াকে সাথে নিয়ে খান জাহান আলী বারোবাজারে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন [২৬]। তারা হলেন–হযরত এনায়েত খাঁ, হযরত আবদাল খাঁ, হযরত দৌলত খাঁ, হযরত রহমত খাঁ, হযরত শমসের খাঁ, হযরত মুরাদ খাঁ, হযরত হৈবত খাঁ, হযরত নিয়াজ মন্দ খাঁ, হযরত সৈয়দ খাঁ, হযরত গণিমত খাঁ, হযরত বিলায়েত খাঁ এবং হযরত শাহবাজ খাঁ [২৭]। পরবর্তীকালে এ সকল আউলিয়াদের নামানুসারে এলাকার গ্রামগুলোর নামকরণ হয়েছে যথাক্রমে- এনায়েতপুর, আবদালপুর, দৌলতপুর, রহমতপুর, শমসপুর, মুরাদগড়, হৈবতপুর, নিশ্চিন্তপুর, সৈয়দপুর, গরিনাথপুর, বেলাট ও শাহবাজপুর [২৮]। তবে তারা পীর খান জাহান আলীর শিষ্য ছিলেন এমন কোন তথ্য গবেষক মহলে স্বীকৃত নয়। বরং পীর খান জাহানের শিষ্যদের যে নাম এতদঞ্চলে বহুল পরিচিত তারা হলেন–হযরত পীর খালাস খাঁ (র.), হযরত বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ (র.), হযরত পীর মহির উদ্দীন (র.), পীর জয়ন্ত (র.), হযরত পীর সুজন শাহ (র.), মুহম্মদ তাহির (পীর আলী), ফতেহ খাঁ (র.) প্রমূখ [২৯]। আব্দুল জলীল বারোবাজারকে 'বৈরাটনগর' বলে উল্লেখ করেছেন [৩০]। তিনি বলেছেন বৈরাট শব্দটি সম্ভবত বিরাট শব্দের পরিবর্তিত রূপ। বারোবাজার বা বড়বাজার শব্দটি ইংরেজিতে সাধারণত 'BARA BAZAR' লেখা হয়ে থাকে। গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান যশোর জেলা-১৯৭৪-এ

বর্তমান বারোবাজার গ্রামটি 'বড়বাজার' এবং ইংরেজিতে 'BARA BAZAR' উল্লেখিত হয়েছে [৩১]। এছাড়া সুশীলা মণ্ডল তার 'বঙ্গদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে 'বারোবাজার'কে 'বড় বাজার' বলে উল্লেখ করেছেন [৩২]। ধারণা করা হয়, মুসলিম (সুলতানি) আমল বা তার পূর্বে এ স্থানে একটি নগর বা বন্দর গড়ে উঠেছিল, সে হিসেবে এখানে একটি বড়বাজার গড়ে উঠাও স্বাভাবিক ছিল। তবে সে সময় এ স্থানটি অন্য কোন নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে ক্রমান্বয়ে নদী ভরাটের ফলে বারোবাজারের বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। ফলে স্থানটি শুধু একটি বড়বাজারে পরিণত হয় এবং ব্রিটিশ আমল থেকে স্থানটি ইংরেজিতে 'BARA BAZAR' লেখা হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে এই বড় বাজার বা 'BARA BAZAR' বারোবাজার হিসেবে উচ্চারিত হতে থাকে এবং সেই থেকে এই বারোবাজার নামের উৎপত্তি। সুতরাং ধারণা করা যায় বারোবাজার নামটি পরবর্তীকালের সৃষ্টি।

৩. প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ

বারোবাজার বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। বারোবাজার ইউনিয়নের অন্তর্গত বাদেডিহি, বাদুরগাছা, বারোবাজার, বেলাট-দৌলতপুর, ঠিকডাঙ্গা, পিরোজপুর, জগন্নাথপুর, মিঠাপুকুরিয়া, হাসিলবাগ, সাদিকপুর প্রভৃতি গ্রাম অর্থাৎ সমগ্র বারোবাজার ইউনিয়নে এবং পশ্চিমে কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের সাতগাছিয়া, নিত্যানন্দী, কুমারহাটি প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে এক বিস্তৃত এলাকাব্যাপী অসংখ্য ঢিবি, পুরাতন দিঘি ও স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রত্নস্থলটি সুলতানি আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারোবাজার ও এর চারপাশে ৩/৪ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রচুর দিঘি ও সাংস্কৃতিক ঢিবি রয়েছে। ১৯৬১ সালে বারোবাজারকে প্রত্নতত্ত বিভাগের অধীনে আনা হয়। ১৯৬৯ সালে বারোবাজারে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালানো হয়। ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে তখন কেবল বেলাট-দৌলতপুর গ্রামে অবস্থিত গোড়ার মসজিদ দুর্বল অবস্থায় টিকে ছিল। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এই এলাকায় অনুসন্ধান করে সে সময় ১৪টি ঢিবি আবিষ্কার করে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে কেবল গোড়ার মসজিদ এবং সাতগাছিয়া আদিনা জামি (গায়েবানা) মসজিদ ছাড়া অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলো সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। শেষোক্ত প্রত্নস্থলটি স্থানীয় জনগণ আংশিক উন্মোচন করে নামাজ পড়ার উপযুক্ত করে তোলে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ১৯৮৯ সালে সাতগাছিয়া প্রত্নস্থলের অবশিষ্টাংশে খনন করে ৩৫ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচন করে [৩৩]। ১৯৯২-৯৩ সালে এলাকাটি পুনরায় জরিপ করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঐ বছর জোড়বাংলা, গলাকাটা ও খড়ের দিঘি এলাকায় খনন চালানো হয়। কয়েক দশক ধরে উৎখননের ফলে বারোবাজার প্রত্নস্থলে ১৫টি স্থাপত্যিক কাঠামো ও অনেক হস্তান্তরযোগ্য প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। এগুলো হলো মসজিদ, মুদ্রা ও টাকশাল, রাজকীয় গ্যালারি সম্বলিত ৩টি বৃহৎ মসজিদ, দুটি জাহাজ ঘাটা বা বন্দর, অসংখ্য স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি, অলংকৃত ইট, টেরাকোটা লিপি, সমাধিক্ষেত্র বা কবরস্থান, লৌকিক ভবন, মৃৎপাত্র, গুটিকা, মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরা এবং অসংখ্য দিঘি-জলাশয় ইত্যাদি।

বারোবাজারের স্থাপত্য ইমারতসমূহকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–১) বিদ্যমান ইমারতসমূহ এবং ২) অবিদ্যমান ইমারতসমূহ। ১) বিদ্যমান ইমারতসমূহের মধ্যে রয়েছে সবই মসজিদ। মসজিদগুলো হলো–সাতগাছিয়া আদিনা জামি মসজিদ, মনোহর মসজিদ, পীরপুকুর মসজিদ, গলাকাটা মসজিদ, জোড়বাংলা মসজিদ, নুনগোলা মসজিদ, পাঠাগার মসজিদ, শুকর মল্লিক মসজিদ, চেরাগদানী মসজিদ, গোড়ার মসজিদ এবং সিংদহ আওলিয়া মসজিদ। ২) অবিদ্যমান ইমারতসমূহ হলো–জাহাজঘাটা, দমদম ভিটা বা সেনানিবাস, কোটালী মসজিদ, শানাইদার মসজিদ, সওদাগর মসজিদ, হাসিলবাগ মসজিদ, বাদশাহ সেকেন্দারের বাড়ি বা গড়বাড়ি, কাজির দরবার, শানবান্দার দরগাহ বা বাগান এবং মুরাদগড়। এছাড়া বেশকিছু মূল্যবান শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো হলো–কোটালী মসজিদ ঢিবি শিলালিপি, চেরাগদানী মসজিদ শিলালিপি এবং টেরাকোটা লিপি (৫খণ্ড) জোড়বাংলা মসজিদ [৩৪]। শিলালিপি বা উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে অন্যান্য স্থাপনাগুলোর অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী কোন দিঘি বা পুকুরের নামানুসারে সনাক্ত হয়েছে। আবার স্থানীয় ব্যক্তি বা অস্পষ্টি কোন পীর-আউলিয়া বা রাজার নামেও অভিহিত হয়েছে। উৎখননে বেশকিছু মুসলমানদের সমাধিক্ষেত্র এবং পাকা কবরও আবিষ্কৃত হয়েছে [৩৫]। স্থানীয়দের বর্ণনায় বারোবাজারে ১২৬টি দিঘি-পুকুর-জলাশয় ছিল। সতীশচন্দ্র মিত্র বেশকিছু দিঘি বা জলাশয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো–রাণীমাতার দিঘি, সওদাগর দিঘি, পীরপুকুর, মীরের পুকুর, ঘোড়ামারি পুকুর, গোড়ার পুকুর, চেরাগদানী দিঘি, গলাকাটা দিঘি, ভাইবোন পুকুর, মনোহর দিঘি, শেখের পুকুর, কচুয়া দিঘি, লোহাশালা পুকুর, উভগাড়া পুকুর, মিঠা পুকুর, নুনগোলা দিঘি, খোনকার দিঘি, জোড়বাংলা/কানা দিঘি, সাতপুকুর, বিশ্বাসের দিঘি, পাঁচপীরের দিঘি, সাতারে দিঘি, আলেখাঁর দিঘি, হাঁস পুকুর, শ্রীরাম রাজার দিঘি, বেড় দিঘি, ফেন ঢালা পুকুর, চাল ধোয়া পুকুর, পিঠেগড়া পুকুর, ডাইল ঢালা পুকুর ও কোদাল ধোয়া দিঘি [৩৬]। আর প্রতিটি দিঘি বা পুকুর সংলগ্ন স্থানে রয়েছে ঢিবি, স্থাপত্য অবকাঠামো, কবর বা সমাধিস্থল। কয়েক'শ বছরের পুরনো এসব দিঘি-জলাশয় এখন মনুষ্য শেনদৃষ্টির কারণে নিশ্চিহ্ন হতে

বসেছে। দিঘিগুলোর অধিকাংশই ব্যক্তি মালিকানায় চলে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত প্রাচীন স্থাপনার ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

৪. বারোবাজারের সমাধিক্ষেত্র বা কবরস্থান

মসজিদের তুলনায় অনুপাতে ও সংখ্যায় বাংলাদেশে সমাধি এবং স্মৃতিসৌধ খুবই কম। তারপরও মুসলিম অন্ত্যেষ্টিক স্থাপত্যের তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ এসব ইমারত। মূলধারার স্থাপত্য-ঐতিহ্য থেকে কিছুটা সরে এসে স্থাপত্যিক নকশায় আঞ্চলিক রুচি ও চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্র্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। আশপাশের মাটির সাথে সমতল রাখার জন্য হাদিসে যথাযথ নির্দেশ (তসভিয়াত আল-কুবুর) থাকা সত্ত্বেও কবরকে জমি থেকে উঁচু করা, ইট বা পাথর দিয়ে আচ্ছাদন দেয়া অথবা স্মারক সমাধিসৌধ নির্মাণ থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিরত রাখা যায়নি [৩৭]। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশেও প্রায় একই অবস্থা। সুলতানি ও মুঘল আমলের স্থাপত্যিক এবং শিলালৈখিক অবশেষগুলো পর্যবেক্ষণ করলে তিন ধরনের সমাধি কাঠামো পরিলক্ষিত হয় : শাসক, অমাত্য এবং সুফি-সন্তদের। বাংলাদেশে সমাধি-স্থানের জনপ্রিয় আরবি ও ফারসি পরিভাষা হলো কবর, মকবরা, মাজার, রওজা, দরগাহ এবং আস্তানা। শেষের তিনটা পরিভাষা কেবল সন্ত এবং সাধু ব্যক্তিদের সমাধির বিষয়ে প্রযোজ্য। ভারতীয় উপমহাদেশের যে কোন স্থানের মত বাংলাদেশেও সমাধিক্ষেত্রকে বলা হয় কবরস্থান (সমাধিক্ষেত্রের ফারসি প্রতিশব্দ)। বাংলার বিভিন্ন মুসলিম সমাধিসৌধে উৎকীর্ণ অন্ত্যেষ্টিক শিলালিপিতে তুরবাত, কবর, মকবরা, রওজা এবং গুম্বদ শব্দগুলো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সাধারণত মসজিদ, মাদ্রাসা, দরগাহ বা সুফি-সাধকদের সমাধির পাশেই নির্ধারিত হয় সমাধির স্থান। কবরের উপর নির্মিত হয় কোন আচ্ছাদন ছাড়া কেবল দেয়ালঘেরা খোলা স্থাপত্য থেকে জাঁকজমকপূর্ণ স্মারক সমাধিসৌধ। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সিলেটের হযরত শাহ জালাল, হযরত পাণ্ডুয়ার (মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ) ছোট দরগার আলাওল হক ও নূর কুতুব-উল-আলমের মত বাংলার বিখ্যাত আউলিয়াদের কবরগুলো কেবল দেয়ালঘেরা খোলা স্থাপত্যমণ্ডিত। খোলা পাকা কাঠামোগুলো 'মৃতের সৎকর্মই কেবল তাকে সুরক্ষা ও আচ্ছাদন প্রদান করবে' গোঁড়া বিশ্বাসীদের এই ধারণার পরিপোষক। ঢাকার রামপালে শায়িত বাংলার আদি মুসলিম আউলিয়াদের মধ্যে অনন্য বাবা আদম শহীদের কবরের উপরেও অতীতে কোন স্থাপত্যিক আচ্ছাদন ছিল না।

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রবর্তক মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দেবকোটে মৃত্যুবরণ করেন। সম্ভবত দেবকোটেই তাকে সমাহিত করা হয়েছিল [৩৮]। বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী মুহম্মদ শিরাণ খলজির কবর মাহিসন্তোষের বলে মিনহাজ-উস-সিরাজ উল্লেখ করেছেন। যদিও কবরটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি [৩৯]। বখতিয়ারের পরবর্তী অন্যান্য তুর্কি শাসকদের কবর কোথায় হয়েছিল এখনও তা অজানা। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্ণর যুবরাজ নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু হলে তার মৃতদেহ দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পিতা শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ তার কবরের উপর একটি আটকোণী সমাধিসৌধ নির্মাণ করে দেন। বর্তমানে একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই, লোকে এর নাম দিয়েছে 'সুলতান ঘরি' (গুহার সুলতান)। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ বিজয়ী খ্যাতনামা যোদ্ধা জাফর খান গাজী ও তাঁর সহযোদ্ধা শাহ সুফি সফিউদ্দিনের কবর হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে। দুই কক্ষবিশিষ্ট ছাদহীন সমাধিসৌধটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন খান-ই জাহান ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে। সমাধিসৌধটি এখনও ভগ্ন অবস্থায় টিকে আছে। বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে টিকে থাকা রাজকীয় সমাধিসৌধ হলো সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সমাধি (সচিলাপুর, মোগরাপাড়া, সোনারগাঁ, ১৪১১-১২ খ্রিস্টাব্দ) এবং পরীবিবির মাজার (সোনারগাঁ) [৪০]। তবে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রাম বা শহরেই রয়েছে অসংখ্য পীর, দরবেশ, আউলিয়ার মাজার ও দরগাহ। যার অধিকাংশই ছাদবিহীন সমাধি। আলোচ্য বারোবাজারেও অসংখ্য পীর-দরবেশ-আউলিয়া এবং শাসকগোষ্ঠীর সমাধি থাকা অমূলক নয়। কারণ পাশাপাশি অসংখ্য বিদ্যমান ও অবিদ্যমান মসজিদ, দিঘি, কবরস্থান দ্বারা তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বারোবাজারে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত স্থাপত্যকীর্তি নিয়ে মানুষের গবেষণা ও উৎসুক্যের অভাব নেই। শুধু অযত্ন অবহেলায় সমাধিক্ষেত্রের নিকষ অন্ধকারে গুমরে মরছে বারোবাজার (সরকার মাহমুদাবাদ) জনপদের এক সময়কার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ভাগ্য বিধাতারা। সমাধিক্ষেত্রের বাসিন্দারা কে কোন সাম্রাজ্য শাসন করেছেন, কি তার নাম-পরিচয় সমাধির অবস্থান দৃষ্টে তা নির্ণয় সম্ভব নয়। কারণ নামফলকহীন কবর বা সমাধিগুলো এখন প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি। তবে নিশ্চিত করে বলা যায়, অসংখ্য পীর-দরবেশ-আউলিয়া এবং সমকালীন শাসকগোষ্ঠীর অনেককেই এই বারোবাজারে যে সমাহিত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবরবাসীদের অধিকাংশই মুসলিম রীতিতে দাফন করা হয়েছে। ফলে নিশ্চিত করেই বলা যায়, এখানে এক সময় একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। যাদের ইতিহাস সাধারণ মানুষের জানাশোনার একেবারেই বাইরে রয়ে গেছে। বারোবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী বহু প্রাচীন সমাধি বা কবরস্থান চোখে পড়ে। এ যাবৎ বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উৎখননে বেশকিছু সমাধিক্ষেত্র ও কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। কবরগুলো পরবর্তী আনুচ্ছেদে আলোচনা করা হলো।

৪.১. গোড়ার মসজিদ, পুকুর ও কবর

বারোবাজার ইউনিয়নের বেলাট-দৌলতপুর গ্রাম বা মৌজায় ঐতিহাসিক গোড়ার মসজিদের অবস্থান (প্লট নং ১৫৫৮) [৪১]। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপর অবস্থিত বারোবাজার বাসস্ট্যাণ্ড থেকে পশ্চিমে বারোবাজার-তাহেরপুর পাকা সড়ক ধরে ১ কিলোমিটার পথ গেলে রাস্তার দক্ষিণে ২০ গজ দূরে মসজিদটির অবস্থান। মসজিদের সামনে বা পূর্বদিকে ৫ একর পরিমিত জায়গা জুড়ে গোড়ার পুকুর অবস্থিত। মসজিদ বরাবর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে পুরাতন ঘাটের সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। মসজিদটি এক সময় গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল [৪২]। স্থানীয় জসীম উদ্দিন নামক জনৈক বৃদ্ধের কাছ থেকে জানা যায়, ঐতিহাসিক ১৬০০ সালের ঝড়ে মসজিদের মাস্তুল ভেঙে পড়ে এবং এরপর থেকে মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল [৪৩]। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উৎখননের ফলে সুদৃশ্য গোড়ার মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী 'গোড়াই বা গোরাই' নামক একজন রাজকর্মচারী মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মসজিদের সামনে একটি পাকা কবরও আবিষ্কৃত হয়। অনেকের ধারণা কবরটি গোরাই নামক রাজকর্মচারীর। আবার অনেকের মতে, গোরাই একজন দরবেশ ছিলেন এবং তিনিই এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। যদিও এর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি ও স্থানীয় ভাষ্যমতে, মসজিদের সামনের কবরটি গোরাই নামক রাজকর্মচারী বা বিশিষ্ট কোন খাদেম বা দরবেশের হলেও হতে পারে এবং তারই নামে উক্ত পুকুর বা মসজিদের নামকরণ হয়েছে। নামফলক না থাকায় কবরবাসীর পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

৪.২. চেরাগদানী মসজিদ, শিলালিপি, দিঘি ও কবর

বারোবাজার বাসস্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে সাদিকপুর গ্রাম। গলাকাটা মসজিদ থেকে আনুমানিক ৪০০ গজ উত্তর-পশ্চিমে সাদিকপুর গ্রামে চেরাগদানী দিঘি (৪ একর) অবস্থিত। চেরাগদানী দিঘির পাশেই একটি জঙ্গলাবৃত ঢিবি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মৌজায় ঐতিহাসিক গোড়ার মসজিদের অবস্থান (প্লট নং ১৫৫৮) [৪১]। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপর অবস্থিত বারোবাজার বাসস্ট্যাণ্ড থেকে পশ্চিমে বারোবাজার-তাহেরপুর পাকা সড়ক ধরে ১ কিলোমিটার পথ গেলে রাস্তার দক্ষিণে ২০ গজ দূরে মসজিদটির অবস্থান। মসজিদের সামনে বা পূর্বদিকে ৫ একর পরিমিত জায়গা জুড়ে গোড়ার পুকুর অবস্থিত। মসজিদ বরাবর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে পুরাতন ঘাটের সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। মসজিদটি এক সময় গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল [৪২]। স্থানীয় জসীম উদ্দিন নামক জনৈক বৃদ্ধের কাছ থেকে জানা যায়, ঐতিহাসিক ১৬০০ সালের ঝড়ে মসজিদের মাস্তুল ভেঙে পড়ে এবং এরপর থেকে মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল [৪৩]। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উৎখননের ফলে সুদৃশ্য গোড়ার মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী 'গোড়াই বা গোরাই' নামক একজন রাজকর্মচারী মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মসজিদের সামনে একটি পাকা কবরও আবিষ্কৃত হয়। অনেকের ধারণা কবরটি গোরাই নামক রাজকর্মচারীর। আবার অনেকের মতে, গোরাই একজন দরবেশ ছিলেন এবং তিনিই এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। যদিও এর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি ও স্থানীয় ভাষ্যমতে, মসজিদের সামনের কবরটি গোরাই নামক রাজকর্মচারী বা বিশিষ্ট কোন খাদেম বা দরবেশের হলেও হতে পারে এবং তারই নামে উক্ত পুকুর বা মসজিদের নামকরণ হয়েছে। নামফলক না থাকায় কবরবাসীর পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

উক্ত ঢিবি খনন করে একটি মসজিদ ও মসজিদের পূব -দক্ষিণ কোণে দু'টি পাকা কবর আবিষ্কার করে। মসজিদ সংলগ্ন দিঘির নামানুসারে মসজিদটির নাম চেরাগদানী মসজিদ রাখা হয়। চেরাগদানী মসজিদের পাশে একটি শিলালিপিও পাওয়া যায়। লিপির ভাষ্যমতে, হোসেন শাহের মন্ত্রী মুহম্মদ কর্তৃক ৯২৫ হিজরিতে চেরাগদানী মসজিদটি নির্মিত হয় [৪৪]। সে মোতাবেক মসজিদ সংলগ্ন কবর দু'টি মুহম্মদ ও তার কোন উজিরের হতে পারে [৪৫]।

৪.৩. জোড়বাংলা মসজিদ, পুকুর ও কবর

বারোবাজার বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সোয়া কিলোমিটার পশ্চিমে বারোবাজার গ্রাম বা মৌজায় (প্লট নং ১৬৮ ও ১৭১) [৪৬] জোড়বাংলা মসজিদের অবস্থান। মসজিদ স্থানটি এক সময় প্রায় দুই বিঘা জায়গাব্যাপী বৃহদাকৃতির ঢিবিতে পরিণত ছিল। ঢিবির আকৃতি বৃহৎ ও বেশ উঁচু থাকার কারণে অনেকের ধারণা ছিল এখানে হয়তো পাশাপাশি দুটি ইমারত রয়েছে। সে কারণে স্থানীয়দের কেউ কেউ এটাকে 'জোড়বাংলা মসজিদ' আবার কেউ 'জোড়বাংলা মন্দির' বলতো। পার্শ্ববর্তী পুকুরটি 'জোড়বাংলা' বা 'কানা পুকুর' দুই নামেই পরিচিত। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট 'জোড়বাংলা মসজিদ' এবং বেশ কয়েকটি প্রাচীন কবর [৪৭]। জোড়বাংলা পুকুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত সিঁড়ির মধ্যে প্রাপ্ত পাঁচ খণ্ড টেরাকোটা লিপির ভগ্নখণ্ড থেকে ধারণা করা যায় (যতটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩৩-৩৮ খ্রি.) সময়ে এই শহরে নিযুক্ত উজির বা শাসনকর্তা শাহ সুলতান

মাহমুদ ইবনে নুসাই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন এবং কবরগুলো উক্ত উজির বা তার পরিবারবর্গের হতে পারে। টেরাকোটা লিপিটি ভগ্নপ্রাপ্ত ও অস্পষ্ট হওয়ায় বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

৪.৪. পীর পুকুর মসজিদ, পুকুর ও কবর

বারোবাজার ইউনিয়নের বেলাট-দৌলতপুর গ্রাম মৌজায় (প্লট নং ১৫৭৩) [৪৮] পীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটি উঁচু ঢিবি ছিল। পার্শ্ববর্তী পীর পুকুরের নামানুসারে ঢিবির নাম 'পীর পুকুর ঢিবি' নামে পরিচিত। ১৯৯৩-৯৪ সালে ঢিবিটি খননের ফলে একটি মসজিদ আবিষ্কৃত হয় এবং মসজিদটির নামকরণ করা হয় পার্শ্ববর্তী পুকুরের নামানুসারে 'পীর পুকুর মসজিদ'। মসজিদের উত্তর পাশে একটি পাকা কবর (বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত) এবং চারপাশে অসংখ্য নরকঙ্কালের ছড়াছড়ি। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী পাকা কবরটি একজন কামেল পীরের এবং কঙ্কালগুলো তার অনুসারীদের। যার জন্য পুকুরটির নাম 'পীর পুকুর' এবং তৎসংলগ্ন মসজিদটির নাম 'পীর পুকুর মসজিদ' রাখা হয়েছে। উল্লেখিত জনশ্রুতি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না কারণ মসজিদের অভ্যন্তরে সুউচ্চ মিনার, মিম্বরের সম্মুখভাগের সামান্য উঁচু প্লাটফরম কোন বুজুর্গ ব্যক্তি সমবেত ধর্মানুসারীদের সামনে বসে ধর্মালোচনার কাজে ব্যবহার করতেন এবং মসজিদে যে রাজকীয় গ্যালারি রয়েছে তার নিচের ছোট নির্জন কুঠুরিতে আরাধনা কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে ধারণা করা হয় [৪৯]। তবে কে এই পীর বা বুজুর্গ ব্যক্তি সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

৪.৫. নুনগোলা মসজিদ, পুকুর ও কবর

বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় অফিস ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে নুনগোলা দিঘির পশ্চিমে নুনগোলা ঢিবি খনন করে একটি মসজিদের সন্ধান পায়। সম্ভবত বারোবাজারের অন্যান্য মসজিদের নামকরণের ক্রমধারায় পার্শ্ববর্তী নুনগোলা [৫০] দিঘির নামানুসারে এ মসজিদটির নামকরণ হয়েছে নুনগোলা মসজিদ। মসজিদটি বারোবাজার বাসস্ট্যাণ্ড থেকে পৌণে এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মসজিদটি বারোবাজার ইউনিয়নের মিঠা পুকুরিয়া গ্রাম বা মৌজায় অবস্থিত (প্লট নং ২০২)। মসজিদের দক্ষিণ পাশে দু'টি পাকা কবর ও একটি কালো পাথরের স্তম্ভ দেখা যায় [৫১]। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী কবর দু'টি পীর মেহের খাঁ ও তার কোন অনুসারীর হতে পারে এবং মসজিদটি সম্ভবত তিনিই নির্মাণ করেছিলেন।

৪.৬. নামাজগাঁও ঢিবি ও সমাধিক্ষেত্র

গলাকাটা মসজিদের পূর্বদিক হতে উত্তরে বারোবাজার গ্রামের মধ্যদিয়ে বারোবাজার-বেলাট কাঁচা রাস্তা ধরে ১ কিলোমিটার অগ্রসর হলে রাস্তার দক্ষিণ পাশে জঙ্গলাকীর্ণ বিশালায়তনের অনুচ্চ ঢিবি (প্লট নং ১৪৩৪, বেলাট-দৌলতপুর মৌজা) [৫২] দেখা যায়। এটি আয়তাকার ঢিবি যার পরিমাপ ৪৮মি.×৪১মি. এবং এর সর্বোচ্চ শীর্ষ পার্শ্ববর্তী জমি থেকে ২ মিটার উঁচু। ঢিবিটির পূর্বদিকে এক সময়ে গ্রামবাসীরা একটি ঈদগাহ তৈরি করে। ফলে ঢিবিটি 'নামাজগাঁও' নামে পরিচিতি পায়। খননের পূর্বে অজ্ঞাত কারণে এখানে নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং স্থানটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৯৫ সালে ঢিবিটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উৎখননে ঢিবির দক্ষিণে ৩টি, পূর্বে ৪টি এবং উত্তরে ১টি বাঁধানো কবর আবিষ্কৃত হয়। পূর্বদিকের বাঁধানো কবরের একটি বেদীর উপর ছোট দু'টি কবর রয়েছে [৫৩]। ২০০১ সালের খননে ৩৬মি.×৪১মি. জায়গা জুড়ে বিস্তৃত একটি সমাধিক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষ উন্মুক্ত হয়। এতে ১৬টি ইট নির্মিত কবর, ১টি কাচা কবর ও ১টি ইট বিছানো উন্মুক্ত অঙ্গন রয়েছে। ইটের তৈরি কবরগুলো দুই ধরনের–ধনুকাকৃতির ছাদ বিশিষ্ট ও করবেল ছাদ বিশিষ্ট। প্রথম প্রকার কবর ১১টি ও দ্বিতীয় প্রকার কবর ৫টি [৫৪]। কবরে কোন নামফলক নেই। এছাড়া অসংখ্য ছড়ানো ছিটানো কঙ্কাল চারিদিকে পরিদৃশ্য হয়। যা থেকে অনুমান করা হয় এটি একটি সমাধিক্ষেত্র বা কবরস্থান।

৪.৭. রাণীমাতার দিঘি ও সমাধিস্থল

বারোবাজার বাসস্ট্যাণ্ডের কয়েক গজ পশ্চিমে তাহেরপুরগামী রাস্তা সংলগ্ন ৩৩ বিঘা জায়গাব্যাপী মিঠা পুকুরিয়া মৌজায় (প্লট নং ২২১) রাণীমাতা দিঘির অবস্থান [৫৫]। দিঘিটি শ্রীরাম রাজার 'মাতার দিঘি' নামে পরিচিত। তবে দিঘিটি যেহেতু পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা সে কারণে দিঘিটি কোন হিন্দু কর্তৃক খনিত নয় বলে ধারণা করা হয় [৫৬]। দিঘিটি হযরত খান জাহান আলী (র.) অথবা কোন মুসলমান শাসক কর্তৃক খননকৃত বলে ধারণা করা হয়। এই দিঘির পাড়ে বেশকিছু ঢিবি ছিল যা কালের বিবর্তনে এখন বিলুপ্ত। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দিঘির দক্ষিণ পাড়ের একটি ঢিবি খনন করে ২১টি পাকা কবরের সন্ধান পায়। কবরগুলো ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো। এর মধ্যে দীর্ঘাকৃতির ১টি কবর রয়েছে যার উপর-নিচ অর্থাৎ চারপাশ পাথর দিয়ে বাঁধানো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় কবরটি কোন বিশিষ্ট আউলিয়ার বা কোন মুসলিম শাসকের হতে পারে। খননে প্রাপ্ত কঙ্কাল দেখে ধারণা করা হয় এখানে নারী ও শিশুদের সমাহিত করা হয়েছিল। বিশেষ যত্ন ও মর্যাদার সাথে বাঁধাই কবরগুলো দেখলে ধারণা করা যায় এগুলো কোন মুসলিম রাজপরিবারের পারিবারিক সমাধিস্থল ছিল [৫৭]। তবে সমাধিস্থলটি কোন রাজপরিবারের এবং কারা এখানে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত আছেন নামফলকের অভাবে তা নির্ণয় সম্ভব হয়নি।

৪.৮. ঘোপের ঢিবি ও কবর

কালীগঞ্জ উপজেলাধীন কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের অন্তর্গত গৌরিনাথপুর (ঘোপ) গ্রামে ঢিবিটির অবস্থান। এটি বারোবাজার বাসস্ট্যাণ্ড থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ঢিবিটি 'ঘোপের ঢিবি' নামে পরিচিত (প্লট নং ১১৭৪) [৫৮]। ১৯৯৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ঢিবিটি খনন করে বেশ কয়েকটি পাকা কবরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে [৫৯]। কবরে কোন লিপি নেই। তবে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, এটি একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এবং মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় এখনও টিকে আছে [৬০]। আর মসজিদের পাশের কবরগুলো নির্মাতা বা স্থানীয় কোন কর্তা ব্যক্তিদের হতে পারে।

৪.৯. পাঁচপীরের মাজার

গোড়ার মসজিদ থেকে প্রায় ১৫০ হাত উত্তরে এবং রাস্তার উত্তর পাশে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি ছোট অনুচ্চ ঢিবি রয়েছে। ঢিবিটি পাঁচপীরের মাজার বলে স্থানীয়দের ধারণা। তবে কোন পাঁচপীর তা নিশ্চিত হয়। আ. কা. ম যাকারিয়া এটি কোন ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে উল্লেখ করেছেন। ইটগুলো খুবই প্রাচীন এবং মুসলিম শাসনামলের বলে মনে হয় না [৬১] । তবে কোন মন্দির স্থলে মুসলমানদের কবর থাকার বিষয়টি অমূলক বলেই মনে হয়।

৪.১০. গাজী, কালু, চম্পাবতীর মাজার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলাধীন বারোবাজার ইউনিয়নের বাদুরগাছা মৌজায় কথিত শ্রীরাম রাজার বেড় দিঘির দক্ষিণ পাড়ে এই মাজারের অবস্থান। স্থানটি বারোবাজার বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সোয়া কিলোমিটার পূর্বদিকে। বেড় দিঘি বলতে গেলে একটা পরিখা, যার মাঝখানে ছিল শ্রীরাম রাজা বা রাজা রামচন্দ্র বা মুকুট রাজার বাড়ি [৬২]। এ দিঘি ঘেরা বাড়ি এখন একটা ভগ্ন ইটের স্তুপ। এখানে যেতে হলে নৌকা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। পাথরে বাঁধাইকৃত কবর তিনটি পাশাপাশি অবস্থিত। এখানে কোন শিলালিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় কবর তিনটি যে গাজী, কালু, চম্পাবতীর তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী কবর তিনটি গাজী, কালু ও চম্পাবতীর এবং বারোবাজারে গাজী, কালু ও চম্পাবতীর মাজার থাকা অমূলক নয়। আ. কা. ম. যাকারিয়া কেন্দ্রীয় অপেক্ষাকৃত বড় কবরটিকে গাজীর, পশ্চিম দিকেরটি কালুর এবং পূর্ব দিকেরটি চম্পাবতীর কবর বলে উল্লেখ করেছেন [৬৩]। যাকারিয়ার উক্ত অভিমত অনুমানের ভিত্তিতেই করেছেন বলে মনে হয়। কবর তিনটি প্রকৃতপক্ষে গাজী, কালু ও চম্পাবতীর কিনা এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে [৬৪]। ঐতিহাসিকভাবে কবর তিনটি তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বা তিনজন শহিদের কবর বলেও ধারণা করা হয় [৬৫]। উক্ত পাশাপাশি তিনটি কবরের দক্ষিণে আরও দু'টি বৃহৎ কবর দৃষ্টিগোচর হয়। কবরগুলো সম্ভবত উক্ত বিশিষ্ট তিনজন ব্যক্তির খাদেমের কবর হতে পারে। তবে কেউ কেউ মনে করেন উক্ত দুটি কবরের একটি দক্ষিণা রায়ের, যিনি গাজীর ভক্ত ছিলেন [৬৬]। উক্ত মাজারের দক্ষিণে প্রাচীন বটগাছের নিজে একটি সুড়ঙ্গ দেখা যায়। স্থানীয়দের মতে, এটি একটি কুপ, যা গাজী ও তার অনুসারিরা ব্যবহার করতেন।

১৯৯২ সালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে কবর তিনটি সুন্দরভাবে বাঁধাই করা হয়। দক্ষিণ দিকের খাদেমের কবরসহ মাজার স্থানটিও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বহু হিন্দু-মুসলমান মাজারটিতে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসে।

৫. বারোবাজারের সমাধিক্ষেত্র বা কবরস্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

বাংলাদেশে সমাধি বা কবর স্থাপত্যে ইসলামি ভাবধারা একটি নতুন সংযোজন। ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় বাংলার অংশ-বিশেষ ও আরও পরে পুরো বাংলা মুসলিম অধিকৃত হওয়ার ধারাবাহিকতায় এ অঞ্চলে একটি নতুন সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি হয়। স্থাপত্য এবং একই সমান্তরালে সমাধিসৌধের ক্ষেত্রেও এ সময় একটি নতুন ধারা লক্ষ্য করা যায়। যদিও ইসলাম ধর্মে কবরের উপর সমাধি-স্থাপত্য নির্মাণে বা কবর পাকাকরণে অনুৎসাহিত করা হয়েছে, তবু স্থাপত্যিক ও লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে প্রাক-মুঘল ও মুঘল যুগে তিন শ্রেণির ব্যক্তির কবরের উপর সমাধিসৌধ নির্মাণ ও কবর পাকাকরণের কথা জানা যায়। এরা হলেন–বিজেতা ও অভিজাতবর্গ, সূফি সাধক এবং গাজী (ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী)। এ ধরনের অনেক সমাধি ও সমাধিসৌধ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আছে। তবে উভয় বাংলাতেই এসব স্থাপত্য নিয়ে নিয়ে বিস্তারিত কোন গবেষণা হয়নি। তাছাড়া এ ধরনের সমাধি বা কবরগুলোর অধিকাংশই স্থাপত্যে বিভিন্ন স্থাপত্যিক শৈলী দেখা যায়। এ পর্যন্ত পাওয়া সমাধি স্থাপত্যে প্রথম দিকে স্থানীয় স্থাপত্যিক শৈলী ও ক্রমে মামলুক, প্রাক-ইলিয়াস শাহী, একলাখী, পরবর্তী ইলিয়াস শাহী, হোসেন শাহী, খান জাহান, প্রাক-মুঘল, মুঘল, আঞ্চলিক ও চালা আকৃতির স্থাপত্যিক শৈলীসহ মুঘল ধারা প্রভাবিত স্থানীয় স্থাপত্যিক শৈলী পরিলক্ষিত হয় [৬৭] | প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে বারোবাজারে কোন সমাধিসৌধ ও লিপিতাত্ত্বিক স্থাপত্যের সন্ধান

পাওয়া যায়নি। তবে এখানকার পাথরে বাঁধাইকৃত কবর ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নর-কঙ্কালের ছড়াছড়ি এবং অসংখ্য সমাধিস্থল কোন মুসলিম শাসনের প্রশাসনিক কেন্দ্রের প্রমাণ নিশ্চিত করে। গবেষণায় সমাধি বা কবরস্থান গুরুত্ব পেলে জাতীয় ইতিহাস বিনির্মাণে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই এবং ঐতিহাসিকভাবে বারোবাজার স্বীকৃতি পাবে বলে মনে করি।

৬. উপসংহার

ভৈরব তীরবর্তী প্রাচীন জনপদ বারোবাজার যেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক প্রত্নসম্পদ মহানগরী। এর অন্দরে অন্দরে লুকিয়ে ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মসজিদ-মন্দির, ঢিবি, দিঘি-পুকুর-জলাশয়, মাজার-কবরস্থান-দরগা, প্রাচীন ইমারতসমূহের ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি এবং মুদ্রা। ১৯৬৯ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বারোবাজারে খনন অব্যাহত রেখেছে এবং এর নতুন নতুন আবিষ্কারে ইতিহাস সমৃদ্ধ হচ্ছে। যদিও সমাধিস্থল বা কবর নিয়ে আগ্রহ ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মধ্যে কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। অথচ শাসক এবং শাসিত উভয়েই শায়িত আছেন ঐসব সমাধিস্থলে, যা বারোবাজারের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের আঁকর উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বারোবাজারে এখনও অসংখ্য কীর্তিরাজির নিদর্শন মানুষের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে। প্রতিটি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বারোবাজার নগরী যেন জীবন্ত হয়ে উঠে। তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, সংরক্ষণের অভাব, ব্যক্তিস্বার্থ, বৈরী আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে বহু প্রাচীন নিদর্শন আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছে। বারোবাজারের লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করতে পারলে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস বিনির্মাণের যাত্রাপথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধুনা বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক কিছু ঢিবি উৎখননের ফলে পুরাতন স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় বারোবাজারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ উৎখনন ও গবেষণায় বারোবাজারের অবস্থান, মুদ্রা ও টাকশাল নগরীর সন্ধান, রাজকীয় গ্যালারি সম্বলিত ৩টি বৃহৎ মসজিদসহ অসংখ্য মসজিদের আবিষ্কার, জাহাজ ঘাটা, সেনানিবাস (দমদম ভিটা), অসংখ্য স্থাপত্য নিদর্শনাদির ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি ও টেরাকোটা ফলক, প্রাচীন দিঘি, পুকুর ও জলাশয় এবং সর্বোপরি অসংখ্য মুসলিম পাকা কবর ও সমাধিক্ষেত্রের অবস্থান ও চারিদিকে নরকঙ্কালের ছড়াছড়ি প্রভৃতি বিবেচনা করে বলা যায়, বারোবাজারে সুলতানি আমলে লখণৌতি, ফতেহাবাদ ও খলিফাতাবাদের ন্যায় একটি প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দর গড়ে উঠেছিল এবং তা ছিল সুলতান নাসির উদ্দিনধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি ও টেরাকোটা ফলক, প্রাচীন দিঘি, পুকুর ও জলাশয় এবং সর্বোপরি অসংখ্য মুসলিম পাকা কবর ও সমাধিক্ষেত্রের অবস্থান ও চারিদিকে নরকঙ্কালের ছড়াছড়ি প্রভৃতি বিবেচনা করে বলা যায়, বারোবাজারে সুলতানি আমলে লখণৌতি, ফতেহাবাদ ও খলিফাতাবাদের ন্যায় একটি প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দর গড়ে উঠেছিল এবং তা ছিল সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শহর মাহমুদাবাদ, যা মুঘল আমলে সরকার মাহমুদাবাদ হিসেবে পরিচিত।

Funding

No funding

Data availability

Data will be made available on request.

তথ্যপঞ্জী

১. ড. অশোক বিশ্বাস, *ঝিনাইদহ জেলার ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯০।
২. এম. এম. ফারুকী সম্পাদিত, *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, ঝিনাইদহ, ১৯৯১, পৃ. ৩।
৩. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers Jessore*, Calcutta, 1912, p. 140.
৪. আ. কা. ম. যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩১২।
৫. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড*, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩২১, পৃ. ১৮৩।
৬. হোসেন উদ্দীন হোসেন, *'যশোরাদ্যদেশ'* আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত, যশোর জেলার ইতিহাস, দিগন্ত প্রচারণী লি., ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৫।
৭. A. Cunningham, *The Ancient Geography of India*, London, 1871, p. 503; Thomas Waltters, On Yuan Chwang's Travels in India, Vol. II, London, 1905, pp. 187-188.
৮. সতীশচন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩; Sohrabuddin Ahmed, 'Antiquities of Bara bazar' Journal of Varendra Research Museum, Vol. 4, Rajshahi, 1975-76, p. 78.
৯. মাতারাণীর দিঘি, কানাই দিঘি, শ্রীরাম রাজার দিঘি, শ্রীরাম রাজার বেড় দিঘি ইত্যাদি বারোবাজারে বিদ্যমান। হিন্দুরা পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ দিঘিকে সূর্য দীঘল দিঘি মনে করে এর পানি অপবিত্র মনে করতো। তাই হিন্দুদের খননকৃত পুকুর বা দিঘির উত্তর দক্ষিণে লম্বা হতো।
১০. Khoundkar Alamgir, *'Archaeological Remains at Barabazar, Jhenidah District'*, Journal of Bangladesh Art, Vol. 3, Dhaka, 1998, p. 263.

১১। Abdul Karim, *'Date of Bokhtiyar Khalji's Conquest of Nadia'*, Journal of the Asiatic Soceity of Bangladesh, Vol. XXIV-VI, Dhaka, 1979-81, pp. 1-10.

১২। Minhaz-i-Siraj, *Tabakat-i-Nasiri*, Vol. 1, Trans. By H.G. Raverty, (Reprint) New Delhi, 1970, p. 548.

১৩। Khoundkar Alamgir, *op.cit.*, p. 263.

১৪। *Ibid*.

১৫। টোডরমল, *ভূমি রাজস্ব ও জরিপ*, ২য় সংস্করণ, কেপি বাগচি এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৩৮২, পৃ. ৭।

১৬। A. B. M. Husain, *'Baro Bazar: Was it the Mahmudabad of Sultani Bangla?'* Essays in Memory of Mumtazur Rahman Tarafder, Dhaka University, 1999, P. 235; M. Mir Jahan, *'Mint towns of Medieval Bengal'* The proceedings of Pakistan History Conference, (3rd session), held at Dhaka, Karachi, 1953, p. 235.

১৭। Abul Fazl Allami, *The Ain-i-Akbari, Vol. II*, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 1989, pp. 145-146.

১৮। A. B. M. Husain, *op.cit.,* p. 236.

১৯। H. Blochmann, *'Contributions to the Geography and History of Bengal,'* Journal of the Asiatic Soceity of Bengal, Vol. 42, 1873, p. 217.

২০। সাদ আহম্মদ, '*বারো বাজারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*', একটি অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ২০০০, পৃ. ৩৯; M. Mir Jahan, *op.cit.*, p. 253.

২১। অধুনা সুলতানি আমলে মুহাম্মদাবাদ শহর পণ্ডিতগণ কর্তৃক পুরাতন মালদহ বা পাণ্ডুয়াতে চিহ্নিত হয়েছে এবং বারোবাজার অঞ্চল ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণের বর্ণনানুযায়ী মাহমুদাবাদ সরকারের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত। ফলে স্থান নির্ধারণে বির্তক রয়েই গেছে। দেখুন, সাদ আহম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

২২। ড. অশোক বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

২৩। আ. কা. ম. যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০।

২৪। সতীশচন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০।

২৫। খান জাহান আলী ৩৬০জন আউলিয়া ও ৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে দক্ষিণবঙ্গে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। ১২ এবং ৩৬০ এর অনেক ব্যবধান। সুতরাং তথ্যটি বেশ বিভ্রান্তিমূলক।

২৬। K.G.M. Latiful Bari (ed.), *Bangladesh District Gazetteers Jessore*, Bangladesh Government Press, Dacca, 1979, p. 301.

২৭। *'ঝিনাইদহের বারোবাজারে ঐতিহাসিক মসজিদের সন্ধান লাভ'*, দৈনিক স্ফুলিঙ্গ, যশোর, ১৫ মার্চ ১৯৮৪।

২৮। নাসির হেলাল সম্পাদিত, *সীমান্ত,* পঞ্চম সংখ্যা (একটি সাহিত্য সংকলন), ঢাকা, ১৩৬৮ বাং, পৃ. ১০।

২৯। গোলাম সাকলায়েন, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী সাধক*, ঢাকা, ১৩৬৮ বাং, পৃ. ৮৩-৮৪।

৩০। আব্দুল জলীল গাজী-কালু-চম্পাবতীর পুঁথির বর্ণনানুযায়ী বৈরাটনগরকে বারোবাজারে অবস্থিত বেলাট-দৌলতপুর নামক গ্রাম বা মৌজার সাথে সম্বন্ধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। দেখুন, এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৮১।

৩১। *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান যশোর জেলা-১৯৭৪*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৭৭।

৩২। সুশীলা মণ্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১ম পাঠ*, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১৬।

৩৩। সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া, ৯ম খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৬২।

৩৪। ইমারতসমূহের তালিকাটি সাদ আহম্মদের বারো বাজারের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে নেয়া হয়েছে।

৩৫। সমাধিক্ষেত্র বা কবরগুলো হলো গোড়ার কবর, চেরাগদানী কবর, জোড়বাংলা কবর, পীরপুকুর কবরস্থান, নুনগোলা কবরস্থান, নামাজগাঁও, রাণীমাতা সমাধিক্ষেত্র, ঘোপের ঢিবি, পাঁচপীরের মাজার এবং গাজী, কালু, চম্পাবতীর মাজার ইত্যাদি।

৩৬। J. Westland, *A Report on the District of Jessore,* Bengal Secretariat press, Calcutta, 1874. p. 156. সতীশচন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

৩৭। এ. বি. এম. হোসেন সম্পাদিত, *স্থাপত্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৩৭।

৩৮। দেবকোট অধুনা দক্ষিণ দিনাজপুরের পীরপাল দরগাহ (নারায়ণপুর), গঙ্গারামপুর নামক স্থানে বখতিয়ার খলজির ছাদবিহীন একটি ভগ্নপ্রায় পাকা কবর রয়েছে। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মনষ্কামনা পূরণের জন্য কবরস্থানে মাটির ঘোড়া মানত করে থাকে।

৩৯। A. H. Dani, *Muslim Archirecture in Bengal,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1961, p. 36.

৪০। এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-১৪০।

৪১। Khoundkar Alamgir, *op.cit.*, p. 265.

৪২। M. A. Bari, '*Khalifatabad, A Study of its History and Monuments'*, An Unoublished M. Phil Thesis, University of Rajshahi, Rajshahi, 1980, p. 202.

৪৩। সাদ আহম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।
৪৪। M. A. Bari, *Khalifatabad*, p.199.
৪৫। স্থানীয় মতে, কবর দুটির একটি মুহম্মদ এবং অন্যটি তার স্ত্রীরও হতে পারে।
৪৬। ড. অশোক বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।
৪৭। সাদ আহম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।
৪৮। Khoundkar Alamgir, *op.cit.,* p. 280.
৪৯। সাদ আহম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।
৫০। নুনগোলা পুকুরের ৪০০ গজ দক্ষিণে রয়েছে ভৈরব নদ। খুব সম্ভবত মধ্যযুগে মুসলমান শাসনকালে ভৈরব নদের মাধ্যমে আনীত লবণের গোলা হিসেবে পুকুরটি ব্যবহৃত হতো। এই লবণ দ্বারা স্থানীয় শহর ও আশপাশের মানুষের চাহিদা পূরণ হতো। সে কারণে পুকুরটির নাম লবণগোলা>নুনগোলা নাম আজও টিকে আছে। দেখুন, ড. অশোক বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।
৫১। নাসির হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২; ড. অশোক বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, ১২৪।
৫২। Khoundkar Alamgir, *op.cit.,* p. 288.
৫৩। সাদ আহম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।
৫৪। সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩।
৫৫। Khoundkar Alamgir, *op.cit*., P. 288; নাসির হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।
৫৬। হিন্দুদের দিঘি পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় না এবং এ ধরণের দিঘি থেকে তারা জলও খায় না–এম. এম আল ফারুকী, *ঝিনাইদহের ইতিহাস*, পৃ. ৫৪।
৫৭। নাসির হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।
৫৮। Khoundkar Alamgir, *op.cit*., p. 288.
৫৯। সাদ আহম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।
৬০। অধ্যক্ষ কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা ঝিনাইদহের পুরাকীর্তি, সৃজনী পাবলিকেশন, ঝিনাইদহ, ২০১০, পৃ. ১৪৬।
৬১। আ.কা. ম. যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮।
৬২। স্থানীয় মতে এভাবেই কথিত আছে।
৬৩। আ. কা. ম. যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮।
৬৪। জনশ্রুতি অনুযায়ী বৈরাটনগরের শাসক দরবেশ শাহ সিকান্দরের পুত্র ছিলেন গাজী। কালু সিকান্দরের পোষ্য পুত্র আর শ্রীরাম রাজা বা মুকুট রায়ের কন্যা ছিলেন চম্পাবতী। গাজীর মাজার ও দরগা নিয়ে নানা কথা প্রচলিত রয়েছে। তার মাজারের স্থান নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। কলকাতার শিবপুরে এবং ২৪ পরগণা জেলার কয়েকস্থানে গাজীর দরগা রয়েছে। গাজীর নামে বারোবাজারে রয়েছে গাজীর জাঙ্গাল ও মৌজা। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ছাপাইনগর বা চম্পাপুর চম্পাবতীর নামানুসারে হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। তাছাড়া বারোবাজারের হাসিলবাগ, খুলনা জেলার শ্যামনগর উপজেলার মানিকপুর, শহিদালীপুর, বারুইখালি, যশোর জেলার লাউজানি, নাভারণ, বনগাঁ, বেনাপোল কলোনী, বাগেরহাটের রণবিজয়পুর প্রভৃতি স্থানে গাজীর দরগা বিদ্যমান। বারোবাজার ছাড়াও ঝিনাইদহের বেশকিছু স্থানে গাজীর মাজার ও দরগা রয়েছে। বাড়িবাথান গ্রামে জালিবিল্লা পুকুরের পাড়ে গাজীর মাজার, জয়দিয়া বাওড়ের কুল ঘেঁষে তমাল গাছের নিচে গাজীর দরগা প্রভৃতি স্থানে গাজীর মাজার ও দরগা দেখা যায়। এ থেকে ধারণা করা যায়, ঝিনাইদহ অঞ্চলে গাজী, কালু, চম্পাবতীর কাহিনী নিছক পুঁথি-পুস্তকের কল্প-কাহিনী নয় হয়তো বাস্তবেও এ চরিত্রটি ছিল। এ এফ এম আব্দুল জলীল তাঁর সুন্দরবনের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, শেষ জীবনে গাজী সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) দেহত্যাগ করেন। এখানে বিশগাঁও-এ (পরবর্তী নাম গাজীপুর) গাজীর সমাধি ও আস্তানা আছে এবং সাতক্ষীরা জেলা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তরে লাবসা গ্রামে চম্পাবতীর মাজার ও দরগা আছে। তথ্যসূত্র : এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৯০; আবু বকর মোঃ শাহজাহান, *ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ*, জেলা প্রশাসন, ঝিনাইদহ, ২০০৩, পৃ. ২৫।
৬৫। নাসির হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৩।
৬৬। গাজী, কালু, চম্পাবতীর পুঁথিতে এসব কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে।
৬৭। সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৫৯।

Published by

RAJSHAHI COLLEGE
Rajshahi 6000, Bangladesh
www.rc.gov.bd